THE LITERARY SCIENTIST
A Multi-Disciplinary Journal for Literature and Science

https://theliteraryscientist.org/

Volume 1
Issue 1
04.12.2023

Paper Title:

আমাদের জল জীবন

Author(s):

অরিত্রী দে

Aritri Dey is a researcher at the Department of Bengali and Literature at Calcutta University.

The Literary Scientist(TLS) A Multi-Disciplinary Journal for Literature and Science follows an Open Access Policy for copyright and licensing. If you are using or reproducing content from this platform, you need to appropriately cite the author(s) and the Journal name.

The Literary Scientist A Multi-Disciplinary Journal for Literature and Science

আমাদের জল জীবন

_____আরিত্রী দে

সারকথা

প্রতিবছর বিজ্ঞানীরা জলদূষণ, জল সংকট নিয়ে বারবার সচেতন বার্তা দিয়ে চলেছেন। আমরাও পড়ছি, শুনছি, জানছি যে ভূগর্ভের জলস্তর কমছে। এমন সময় আসবে যখন খাবার জল অত্যাবশকভাবে অর্থমূল্যে কিনতে হবে। কেমন হবে একদিন যদি নিঃশ্বাস নেওয়ার আলো-বাতাসও এমনভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় এসে পড়ে! পৃথিবীর আদিম উপাদান জল। সেই জলের জোগানে ভূগোল আর বিজ্ঞানের ভূমিকা যেমন ব্যাখ্যা করেছি এই নিবন্ধে, তেমনি জলকেন্দ্রিক সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় জল সংরক্ষণের সাবেক আর চিরন্তন কৌশল সম্পর্কে বলতে চেয়েছি। প্রসঙ্গক্রমে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের নদ-নদীর জলধারার প্রকৃতি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করেছি। জলজীবন হিসেবেই এই সামগ্রিক ব্যাপারকে বুঝেছি।

সূচক শব্দ : জলচক্র, জলাশয়, কুন্ড, জলবন্টন, গজধর, বাঁধ, নদীর গতিপথ, জল সংস্কৃতি

'পুরানো সেই জলের কথা':

জলই যে জীবন, তোতা-ইতিহাসের মত এ শিক্ষা কোন ছোটবেলা থেকে আমাদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে ইস্কুল। কিন্তু পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা ত নয় সে শিক্ষা, ফলে মাথা ধরে নাড়িয়ে দিলেও চৈতন্য হয়না। বাষ্পীভবন, ঘনীভবন ও অধঃক্ষেপণের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠ আর ঊর্ধ্বাকাশের মধ্যে আবর্তিত জলচক্রের ভৌগোলিক আর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না হয় ছবি দিয়ে আঁকা থাকল বইয়ের পাতায়। তার গুরুত্ব জানার সঙ্গে সুস্থ নাগরিকের দায়দায়িত্বের সম্পর্কটা যে কোথায় তা বুঝতে মাথা চুলকোতে হয় বৈকি! ভারতীয় সংবিধানের একাদশতম তালিকায় 'ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ' এর এগারোটির মধ্যে অন্যতম হল বন, হ্রদ, নদী সহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা, তার স্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং জীবিত প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা।[১] অধিক কথনে বাচালের মাত্রাছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় কেবল 'জলজীবন'কেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু করা হল। তাই হাঁটি পা পা করে প্রথমে বুঝতে হবে জলকে ঘিরে যে জীবনচক্র চরকি পাক খাচ্ছে, তার কথা। একবিংশ শতাব্দীতে এসে আজ আমরা স্মৃতিচারণ করছি আমাদের ফেলে আসা জলজীবনের, তার মূল্যবোধের, বুঝতে পারছি গত কয়েক বছরে আমাদের জলচর্যার বদল ঘটেছে বিপুল। বুঝতে হবে গ্রাম ও শহরের জলজীবনকে, আসুন কান্ডজ্ঞানে ফিরি। প্রথমেই বলার যে শক্তি ও ধৈর্য্য স্বরূপিণী ধরিত্রীদেবীর চারটি প্রধান মন্ডলের (Sphere) বিন্যাস লক্ষ্য করার মত। 'লিথোস্ফিয়ার', 'হাইড্রোস্ফিয়ার', 'বায়োস্ফিয়ার' ও 'এটমোস্ফিয়ার' পর্যায়ক্রমে অবস্থান করে মাটির ওপর জল, জলের ওপর জীবমন্ডল এবং তার ঊর্ধ্বে বায়ুমন্ডলের সুষম বন্টন ঘটায়। জল ছাড়া গোটা প্রাণমন্ডলেরই (বায়োস্ফিয়ার) অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। 'ভূ-পৃষ্ঠের তিনভাগ জল' অর্থাৎ পঁচাত্তর শতাংশ জলভাগ। শিল্পের ও কৃষিকাজের প্রয়োজনীয়

জল, পরিশ্রুত পানীয় জলের উৎস সমুদ্র, ছোট- বড় জলাশয়, হ্রদ, খাল-বিল, নদী-নালা। কিন্তু এই যে জল খরচ হচ্ছে, তবু তার সাম্রাজ্য শেষ হচ্ছেনা তার কারণ বারিচক্র (water cycle)। সূর্যের তাপে ভূ-পৃষ্ঠের জল (এমনকি প্রাণী শরীর থেকে নির্গত বর্জ্য জল) বাষ্পীভূত হয় এবং মেঘ থেকে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পৃথিবীতে ফেরত আসে। কোথাও কোথাও তুষারপাত বা শিলাবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে জল ফিরে আসে পৃথিবীর বুকে, ভরিয়ে তোলে আমাদের ব্যবহার উপযোগী জলের উৎস গুলিকে। প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ জলের অণু ভেঙে (H_2O) অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন পরমাণু অক্সিজেন চক্র ও হাইড্রোজেন চক্রে প্রবেশ করে অর্থাৎ অন্য কাজে যোগ দেয়। গাছ তার সালোকসংশ্লেষে জল বা জলীয় বাষ্পকে কাজে লাগিয়ে তার হাইড্রোজন থেকে গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) তৈরি করে। অন্যদিকে জলের দুটি অণুর দুই পরমাণু অক্সিজেন মিলে একটি অক্সিজেন অণু ($\mathbf{O_2}$) গঠন করে, যা আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করে। পরবর্তীতে ঐ পরমাণুগুলিই আবার সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জল তৈরি করে।

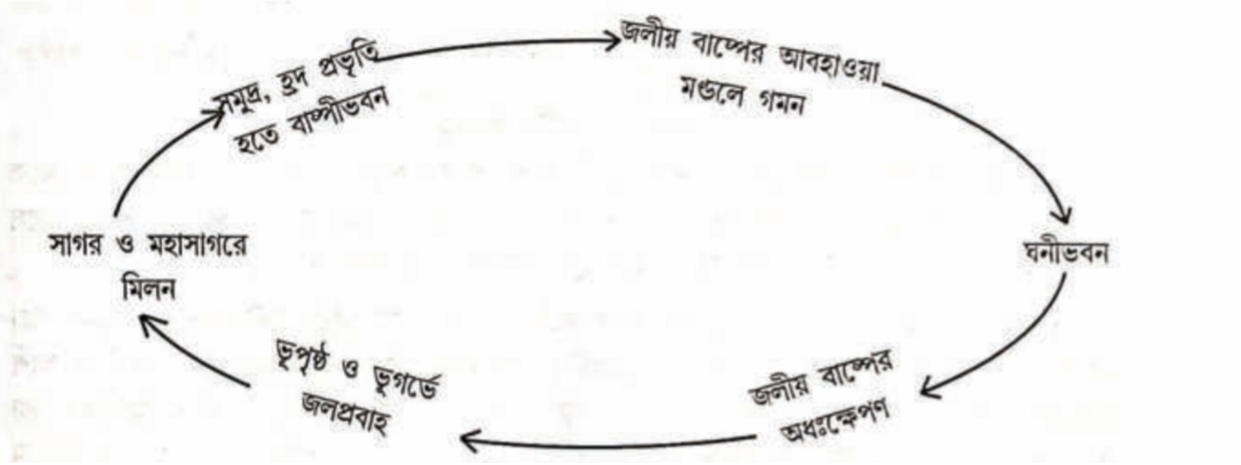

জল সংরক্ষণ ও পেশার পারস্পরিকতা

আধুনিকতা'র গোলকধাঁধায় আসার বহু আগে থেকেই খাল, বিল, নদীসহ অন্যান্য জলাশয় নির্মাণের মধ্যে দিয়ে সমাজ আর তার সদস্যদের যুগলবন্দী পথ চলা ছিল। বসত গড়ার জন্য প্রাথমিক শর্তই ছিল বসতিস্থলের সুরক্ষা, গাছের ছায়া আর জলের সুলভতা, তা সে দীঘি-পুকুরের হোক বা কুয়োর হোক। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যখনই মানুষ একের অধিক হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বাস করতে গেছে, প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে নিয়েছে তালাব (পুকুর), বেরি (ছোট কুয়ো), চৌকরি প্রভৃতি। পানীয় জলের জন্য, সেচের জলের জন্য, নিত্য ব্যবহারের জন্য তখন এলাকার জনসংখ্যা অনুযায়ী পুকুর কাটার রেওয়াজ ছিল। পুকুর কখনও প্রাকৃতিক কারণে তৈরি হত কখনও বা মানুষ তৈরি করত। এতে সাধারণ মানুষের লোকালয়ের দৈনন্দ্যিন কাজ মিটত। তবে পুকুরের বদ্ধ জল খানিকটা মজে যাওয়া ধরনের হয়ে যেত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। অভিধানে পাচ্ছি 'পনড' (pond) বা ডোবা বলতে 'a pool of stagnant water'।[২] আবার দিঘি সাধারণত শাসকবর্গ দ্বারা খনিত হত সমাজের জন্য। তখন দীঘি-পুকুর কাটা 'পুণ্য' কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল, রাজা-রানী-গৃহস্থ 'মহাত্মা'র শিরোপা পেতেন লোকালয়ে এসব নির্মাণের জন্য। প্রতি গ্রামে নানা উপলক্ষ্যে ছোটো বড়ো প্রচুর দিঘি পুকুর কাটা হত। সরোবর অনেক বড় জলাশয়, একে সুদৃশ্য ভাবে বাঁধানো হত। আর বাংলায় হ্রদ বলতে আমরা সমুদ্র লগ্ন জলাশয় বুঝি। পাহাড় থেকে নিঃসৃত বৃহৎ প্রাকৃতিক জলাধার কেও 'লেক' বা হ্রদ বলি। অভিধান অনুযায়ী- a large body of water entirely surronded by land।[৩] তা সে জলের বহুধারার মত পুকুর, নাছপুকুর, সরোবর, দিঘি, তাল, বাঁধ, ডোবা, ঝিল, বিল, হ্রদ, গইড়া- প্রভৃতি বিভিন্ন

রকম বা ফর্ম হলেও জলাশয় তো জলাশয়ই। ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী পৃথক করা থাকত সেসব জলাশয়, যেমন গ্রামের মন্দিরটার জন্য আলাদা পুকুর (সংরক্ষিত পুকুর), বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলোর খিড়কি দরজার কাছে রাখা হত নাছপুকুর আর তুলনায় সামান্য অবস্থার গৃহস্থের মেয়েদের আব্রু ছিল বাঁশঝাড় লাগোয়া 'গড়্যা' বা ডোবা। এখন ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়ার বৈচিত্র্যে বিভিন্ন স্থানে জলপ্রবাহ ও জল ধরার কৌশল ভিন্ন ভিন্ন, ফলে জলজীবনের ধারাও পৃথক হয়ে যায়। যেমন ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে জলের অভাব সবচেয়ে বেশি। রাজস্থানের আরাবল্লি পার্বত্য অঞ্চলের গাছগাছালির জন্য বাতাসে যতটুকু ভাসমান জলীয় কণার পরিমাণ বাড়ে তার ফলস্বরূপ অল্প বৃষ্টিপাতেই আলোয়ার দিয়ে রূপারেল নদী প্রবাহিত হত। কিন্তু ক্রমে গাছশূন্য হওয়ায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যায়, মাটির লেয়ার পাতলা হতে থাকে এবং কৃষিকাজ প্রায় বিলুপ্ত হয়। এলাকাবাসী জোহড় নির্মাণ করে এই সমস্যার সমাধান করল।[৪] যে অঞ্চল দিয়ে ঐ যৎসামান্য বৃষ্টির জল প্রবাহিত হয়ে যায় (আগোর), সেখানে পাথরের খন্ড সাজিয়ে সীমানা গেঁথে দেওয়া হল। তাতে যেমন পানীয় জল মিলল, তেমনি সেচের কাজে প্রয়োজন মত ব্যবহারও করা গেল। আর এক জায়গায় জল জমা থাকার ফলে সছিদ্র মাটি দিয়ে ভূমিগর্ভে জল সহজেই প্রবেশ করতে পারে, বাড়ে ভৌমজলস্তর। লোকালয়ের বহু পাতকুয়ো যেমন তাতে ভরে উঠল তেমন বহু শুকনো নদীও টলটলে জলে ভরে গেল। এছাড়াও আশেপাশের নরম ভিজে উর্বর মাটিতে সবুজ ঘাস আর গাছ জন্মাল। কোথাও কোথাও সামাজিকভাবে কুন্ড তৈরি করে নয়তো বাড়ির ছাদে টাঁকা তৈরি করে বৃষ্টির জল বা 'পালরপানি' ভরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।[৫] ইঁট- ফৌগ কাঠ-বালি-খড়িয়া পাথর প্রভৃতি যখন যেখানে যা মেলে তাই দিয়ে সর্বজনীন কুন্ডি, তার ঢাকনা তৈরি হয়। সঙ্গে থাকে জল ওঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় কপিকল। বাড়ির মেয়েরা ঘরে চৌকাবর্তন তৈরি করে জল সংরক্ষণ করে। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের পূর্ব ঢালে অবস্থিত পুরুলিয়াতেও জল সংরক্ষণের

চেষ্টা চালাতে হয়। ল্যাটেরাইটযুক্ত অনুর্বর মৃত্তিকা, ভূমি সিঁড়ির ধাপের মতো উঁচু নীচু অসমতল হওয়ায় বৃষ্টির জল জমবার এখানে সুযোগই পায় না। আবার ভূস্তর কঠিন শিলাযুক্ত হওয়ায় জল মাটির নীচে বেশি দূর চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকতেও পারে না। ফলে বৃষ্টিতে গড়িয়ে যাওয়া জলের পথে শুধুমাত্র একদিকে একটি পাড় বেঁধে দিয়ে পুকুর নির্মাণ করেই জল সংরক্ষণ করা যায়। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূমের কাঁকুড়ে মাটি বেয়ে পরিষ্কার জল নীচে গড়িয়ে যেতে পারার পথ বন্ধ করে মাটি বেঁধে 'বাঁধ' (এই জলাশয়ের তিনদিক খোলা), জলাশয় বানিয়ে নেওয়া হয়|

এই যে বাঁধ, কুন্ড, পুকুর, দিঘি, কুয়ো খোঁড়ার সবচেয়ে জরুরি তত্ত্ব, গ্রামের সাধারণ মানুষেরা সেসব জানত। ভূমির ঠিক কোনখান দিয়ে বৃষ্টির জল সবচেয়ে বেশি পরিমাণে গড়িয়ে আসে বা চারপাশের শুষ্কতার মধ্যেও কোন জায়গার মাটি খুঁড়লে জলস্তর মিলবে ইত্যাদি। এই কুয়ো, পুকুর কাটার স্থান নির্বাচন করতে পারা বিশেষ জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত ছিল। এঁরা 'গজধর' নামে পরিচিত ছিলেন অর্থাৎ 'গজ' ধারণ করেন বা মাপতে পারেন যিনি।[৬] প্রায় স্থাপত্যশিল্পীর মর্যাদা পেতেন কেননা সহজে বলতে পারতেন মাঠের কোন দিকে কতটা ঢাল, এর জন্য তাদের পুঁথিগত জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হতে হয়নি, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় অর্জন করেছেন জলের বিজ্ঞান। জলাশয় তৈরির সময় মাটি কাটাই প্রধান, জল গড়িয়ে আসার পথটি সযত্নে খেয়াল করে সেই গড়িয়ে আসা জল যেখানে সবচেয়ে বেশি জমে সেটাকেই কাটার সঠিক জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তারপর কাটা মাটি তুলে তৈরি হয় জলাশয়ের পাড়। যেখানে যেমন মাটির স্বভাব, যতখানি বৃষ্টিপাত, প্রত্যেক জায়গায় সেইমত খনিত হয় জলাশয়। কোথাও পাড় হয় এমন যেন চারপাশ থেকে গড়িয়ে আসা জল সহজে গড়িয়ে পুকুরে নামে। কোথাও মাত্র এক বা দুদিক থেকেই পরিষ্কার জমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসা জল পুকুরে এসে ঢুকবে, আবার কোথাও পাড়ের কাজ বাইরের গড়িয়ে আসা জল থেকে পুকুরকে রক্ষা করা। যেমন গাঙ্গেয় উপত্যকার যে অঞ্চলে চিটামাটির প্রাধান্য,

সেখানে পুকুর কাটার সময়ে খোঁড়া মাটি দিয়ে পাড় উঁচু করে দেওয়া হয় যাতে বর্ষার সময় বাইরের ময়লা জল গড়িয়ে আসতে না পারে। গজধর কাজের সময় তাঁর জোড়িয়া বা সহকারীকে সঙ্গে নিতেন। কুয়ো কাটা বা পুকুর তৈরির পর সমবেত ভোজের ব্যবস্থা থাকত, সেখানে গোটা গ্রামের জলের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য গজধরদের সম্মান ছিল দেখার মত। এই অনুষ্ঠান বোঝায় জলজীবন 'আমাদের' ছিল, তাকে নিয়ে তৈরি হওয়া সমস্যা আর সমাধানও 'আমি'র পরিবর্তে আমাদেরই। বর্তমানে এই সাধারণ বোধ বিশেষে পরিণত হয়েছে, 'আমি' ভাবনা এতই পেয়ে বসেছে যে বুঝছিনা যৌথতা ছাড়া একটা গোটা জলজীবনের যাপন হওয়া সম্ভবই না, কাজেই দায়ভার বলো সচেতনতা বলো প্রত্যেককে ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে হবে। আজ জল সংরক্ষণের জন্য বহু বিদেশি অভিজ্ঞ কোম্পানিকে টাকার বিনিময়ে ডেকে এনে যন্ত্রপাতি দিয়ে জলসমস্যার সমাধান করাতে হচ্ছে। টিউবঅয়েল কোম্পানিকে অনেক কষ্ট করে যন্ত্র দিয়ে জায়গা বেছে নিতে জানতে হয়, কিন্তু এসব জানাজানি খুব সহজ ছিল সাধারণ মানুষের কাছে, তাদের পরের ওপর নির্ভর করতে হয়নি। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাটে গজধর, ওড় (ঔড়, ওটিয়া, ওঢহি) দের সংস্কৃতি এখনও পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশে গজধরেরাই 'পথরোটা' নামে পরিচিত। মাটির প্রকৃতি থেকে শুরু করে তার আচরণ, ভবিষ্যৎ- সবটা বুঝতেন 'মটকুটা'রা। জল আর মাটি পরস্পর অছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ, তবে না 'জীবন'! জায়গামতো মাটি খুঁড়লেই জীবনের প্রস্রবণ বেরিয়ে আসে। মাটি তার গর্ভে জল ধারণ করেই উর্বর, ঠিক যেমন করে একজন নারীর গর্ভে তার প্রাণের ভ্রূণটির চারপাশে জলের স্তর রচিত হয়। এই মাটিকে স্বর্ণ বিবেচনা করে যারা মাটি খুঁড়ে সগর রাজার পুত্রদের মত জল আনত তারা 'সোনকর'।

আবার পাথরের সমস্ত ধরনের কাজ ভালোমত জানতেন যারা, দক্ষিণ ভারতে তারা 'কৌরি' নামে পরিচিত। দশে মিলে জলজীবনকে টিকিয়ে রাখার এই প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল 'বুলাই'দের, তাদের কাছে জমি সহ গ্রামের

সম্পূর্ণ তথ্য থাকত। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জলাশয় নির্মাণের ক্ষেত্রে জমির মালিকানা বিষয়ে অর্থনৈতিক বর্গের দ্বন্দ্ব প্রবলভাবে রয়েছে বলেই জমি সংক্রান্ত তথ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

সেই সুদূর প্রাচীনকাল থেকে আমাদের উৎপাদন মূলতঃ 'কৃষি-সংস্কৃতি' নামে পরিচিত ছিল। এই সংস্কৃতি এমন পরিসর প্রস্তুত রাখত যাতে কৃষিকাজ, গোচারণ ইত্যাদির জন্য মাটি আলগা হয়ে গেলে জল বেশি মাত্রায় অনুস্রাবণের মাধ্যমে ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। তার সাথে বরাবর হাত ধরাধরি করে থেকেছে 'জল সংস্কৃতি'। এই জলসংস্কৃতিকে ঘিরে থেকেছে হাজারো সংস্কার, তিথি-পুজো-শ্মশানযাত্রা এমনকি অশৌচমুক্তি ইত্যাদি আচার জলে ডুব দিয়ে সম্পন্ন হয়। আমাদের কাছে দুই নদীর মিলনস্থল যজ্ঞের প্রকৃষ্টতম পুণ্যস্থান রূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে, তীর্থযাত্রা মানেই ত 'নদীর ঘাট'। খাল বিল সায়র পুকুরে ভরভরন্ত বাংলার জলজীবনময় সংস্কৃতির কিছুটা বোঝা যায় পূর্ণিপুকুর ব্রততে। বৈশাখে পুকুরের জল যাতে না শুকোয়, তার জন্য করা হত-

-পূর্ণিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজে রে দুপুরবেলা?
আমি সতী লীলাবতী
ভাইয়ের বোন পুত্রবতী,
হয়ে পুত্র মরবেনা
পৃথিবীতে ধরবেনা।[৭]

প্রতীকী পুকুর কেটে তার মধ্যে বেলের ডাল পুঁতে, জল ঢেলে পূর্ণ করে তারপর বেলের ডালে ফুলের মালা ও পুকুরের চারধারে ফুল সাজানো হয়। মনে রাখতে হবে এই ব্রতকথা মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, সেখানে বিশেষের বদলে গোষ্ঠীগত আকুতি আছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে স্বাধীনতার ঠিক পরপর যখন উঁচু বাঁধ প্রকল্পগুলি

সামাজিক উন্নয়নের স্তম্ভ হয়ে উঠল, তখন থেকেই 'আমরা' থেকে 'আমি'তে আসা, একত্রে ক্রিয়াকর্ম গুলো আর অনুষ্ঠিত হয়না। আবাদযোগ্য জমি, চারণভূমি যত বেশি করে প্রোমোটারের কাছে বিক্রি হল, 'এ-পার্টমেন্টে'র (Apartment) কালচার যত বেশি করে চর্চিত হতে থাকল তত মাটির ওপর আচ্ছাদন রূপে কাজ করল ঘরবাড়ি, পাকা রাস্তা; কমতে লাগল ভৌম জলের স্তর। কিন্তু যে জলজীবন চর্চিত হয়েছে সুদূর প্রাচীনকাল থেকে, তার স্বাস্থ্যের কি ব্যবস্থা ছিল? বিশেষত নদী ছাড়া বাকি তৈরি করা জলাশয়গুলি স্বভাবগতভাবে বদ্ধ প্রকৃতির। যেখান থেকে জল গড়ানে এসে কুন্ড, দিঘি, পুকুরের আগোরে (জলের কোষাগার) জমা হয়, সেই জায়গাগুলিতে জুতো পরে যাওয়ার বা অপরিষ্কার রাখার অনুমতি ছিলনা। জলাশয় জলে ভরে উঠলেই তাতে মহাসমারোহে মাছ, কচ্ছপ, কাঁকড়া এনে রাখার ব্যবস্থা করা হত।[৮] এমনকি জল গভীর হলে কুমীরও। দেওয়া হত বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদ, যে অঞ্চলে যেমন পাওয়া যায়। যেমন রাজস্থানে কুমুদিনী, চকসু, মধ্যপ্রদেশে গদিয়া বা চিলা, যাতে জল পরিষ্কার রাখা যায়। বাংলার জলাশয়ে মূলতঃ জন্মায় শালুক, পদ্ম, কচুরিপানা, খাঁড়ি, জলজ ঘাস প্রভৃতি। আর এ তথ্য ত আমাদের সকলের জানা যে বিবিধ রকমের মাছেদের খাদ্য হয় এতে। তবে মাথায় রাখতে হয় জলাশয়ের পরিবেশে উদ্ভিদ আর হাঁস, মাছ প্রভৃতি জলচর প্রাণী সমানুপাতিক হতে হবে। আগাছা বাড়লে তা পচে জলের তলদেশে বিষাক্ত গ্যাসের জন্ম দেয়, জলে অক্সিজেন কমে গুণাগুণ নষ্ট হয়, প্রাণীরা মারা যায় ও বাস্তুতন্ত্র ভেঙে পড়ে। মোট কথা অজৈব পদার্থ, উৎপাদক জীবপুঞ্জ, খাদক প্রাণী ও বিয়োজক নিয়ে পুকুর বা অনুরূপ জলাশয় আত্মনির্ভরশীল বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু এর কার্যকারিতা নির্ভর করে কি পরিমাণে সৌরশক্তি গৃহীত হয় ও কি হারে এর চারপাশ থেকে জল ও অন্যান্য পদার্থ প্রাপ্তি ঘটে, তার ওপর। জলাশয়ের পাড় রক্ষার জন্য আম, নিম, অরহড় গাছ লাগানোর পাশাপাশি খেয়াল রাখা হত যেন ইঁদুর বাসা করে পাড়ের মাটি আলগা না করে দেয়।

তাই নতুন তৈরি জলাশয়ের পাড়ে সরষের খোলের ধোঁয়া দেওয়া হত। সেই সম্মিলিত প্রচেষ্টা আজ কোথায়! বরং ন্যাড়া পাড়ের পুকুর, কচুরিপানায় ভরা জলাশয় দেখতেই অভ্যস্ত আমরা। আর আমরা ভুলে গেছি ঐ যে 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' এর পাঠকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে আত্মকেন্দ্রিক যাপন করছি, ইঁদুরের কামড় ত সেখানেই।

'নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ':

"এ নদী সে নদী একখানে মুখ,
ভাদুলি ঠাকুরানি ঘুচাবেন দুখ
এ নদী সে নদী একখানে মুখ,
দিবেন ভাদুলি তিনকুলে সুখ"[৯]

নদীমাতৃক এই নিভৃত নীড়ের আশায় ব্রতকথা সংগ্রহ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। টলটলে জল ভরা নদী, তার কূল ছাপিয়ে জল আর বাহিত পলি - মাটিকে উর্বর করে সোনার ফসল ফলায়; সাধারণ পল্লীপ্রধান দেশে উপচে পড়ে সুখ। হিমালয়, আরাবল্লী, বিন্ধ্য, সাতপুরা, পশ্চিমঘাট, পূর্বঘাট, নীলগিরি পাহাড়-পর্বতশ্রেণীর প্রাকৃতিক সুরক্ষা কবচ দিয়ে ঘেরা যে দেশে নদী-উপনদী, শাখানদীর শিরা উপশিরা রয়েছে, সে দেশ খাদ্য বিষয়ে পরনির্ভরশীল ছিল এ কথা সাম্প্রতিক কিছু মুষ্টিমেয় বর্গের মধ্যে চর্চিত হতে দেখে মোটেও ভালো বোধ হয়না। আর ভারতে ত শুধুমাত্র জমি না, রীতিমতো আবাদযোগ্য জমি ছিল তার চিরকালীন জলজীবনকে ঘিরে। বুন্দেলখন্ড মালভূমি, পূর্ব ভারতের ছোটনাগপুর ও দন্ডকারণ্য মালভূমি, শিলং, দাক্ষিণাত্য, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, মালবা মালভূমি এবং উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমির ওপর দিয়েই নদীদের সংসার। উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমি পূর্বদিকেও বিস্তৃত হয়েছে। রাজ্যের উত্তরে যেমন হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গ, তেমনি দক্ষিণে উপকূলীয় সমভূমি, পশ্চিমে মালভূমি ও

পূর্বদিকে গাঙ্গেয় বদ্বীপ, অর্থাৎ মালভূমি এবং সমভূমির সহাবস্থান দেখা যায়। পার্বত্য, মালভূমি ও সমভূমি এলাকা ভেদে ভূমির ঢাল বাড়া কমা অনুযায়ী জলপ্রবাহ, তার ধারণক্ষমতা, ক্ষয়ক্ষমতা ইত্যাদি নির্ভর করে, এ আমাদের সকলের জানা। নদীর উচ্চগতিতে প্রধান কাজ ক্ষয়কাজ, মধ্যগতিতে মূলতঃ বহনকাজ এবং নিম্নগতিতে সঞ্চয়। সিন্ধু নদী কৈলাসের সেনগগে খাবাব হিমবাহ থেকে জন্ম নিয়ে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে এবং লাদাখ হয়ে দক্ষিণে বেঁকে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। বোঝা যায় এই নদীর পার্বত্য গতি ভারতের ওপর দিয়ে এবং আরব সাগরের কাছে নিম্নগতিতে সঞ্চয় কাজের মাধ্যমে ব-দ্বীপ তৈরি করেছে।[১০] বামতীরে আর ডানতীরে বিছিয়েছে ধানসিঁড়ি, ঝিলম, ইরাবতী, শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, কামেং, মানস, তিস্তা, সঙ্কোশের মত নদী। উত্তরাখন্ড রাজ্যে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গা, হরিদ্বার পর্যন্ত পার্বত্য অবস্থা এবং বিহারের রাজমহল পর্যন্ত মধ্যগতিতে সমভূমি অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছে। এরপর পাহাড়ের পূর্বদিক দিয়ে দক্ষিণমুখী হয়ে গঙ্গানদী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে ও মূর্শিদাবাদের কাছে পদ্মা আর ভাগীরথীতে বিভক্ত হয়ে দ্বিতীয় শাখায় ভাগীরথী-হুগলি বদ্বীপ গঠন করেছে।[১১] সুদীর্ঘ গতিপথে যমুনা, শোন, গোমতী, ঘর্ঘরা, রামগঙ্গা, গন্ডক, কোশী উপনদীগুলোর নিজের কাহিনী ত আছেই। আবার ব্রক্ষ্মপুত্র চীনের চেমায়ুং দুং থেকে জন্ম নিয়ে আসামের ডিহংয়ে ঘরবাড়ি বানিয়ে বাংলাদেশে পদ্মার সঙ্গে মিশে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এখন ভারতের ঊর্ধাংশ থেকে কিছু নীচে মধ্যভাগের দিকে চোখ সরালে বোঝা যায় মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকের বেশিরভাগ ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত দাক্ষিণাত্য মালভূমির ঢাল অনুযায়ী মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে গতিপথ রচনা করেছে। ভারতের পশ্চিম উপকূল চ্যুতি যুক্ত হওয়ায় আরবীয় পাতের চাপ প্রতিরোধ করতে গিয়েও পশ্চিম উপকূল পূর্ব দিকে বেঁকে ঢাল যুক্ত হয়। আবার পূর্ব উপকূল অগভীর ও সমতল অংশ, ফলে পূর্ববাহিনী নদীগুলো মধ্যভাগের মালভূমি থেকে

উৎপন্ন হয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে প্রচুর পলি সঞ্চয় করে সমতলে বদ্বীপ গঠনে সক্ষম। উপকূলের বালুকাময় সমভূমি, গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চল ও সুন্দরবন অঞ্চল এর অন্তর্গত। অন্যদিকে পশ্চিমদিকের ভূমি কঠিন শিলাভিত্তিক। পশ্চিমঘাট, বিন্ধ্য, সাতপুরার গুণে এই দিকের ঢালও খাড়া। ফলে নর্মদা, তাপ্তির মত পশ্চিমবাহিনী নদীগুলো দ্রুতগতিতে মোহনায় পড়ে সঞ্চয়কাজের সুযোগ পায়না, এমনকি বহনও করতে পারেনা বেশি কিছু। বোঝা যায় নদীর স্বল্পতা ও ভূ-প্রাকৃতিক কারণে পূর্বদিকের তুলনায় পশ্চিমদিক অনেক বেশি পাথুরে, রুক্ষ ও শুষ্ক। এই এলাকাগুলির কথা মাথায় রেখে পূর্ববাহিনী নদীগুলির কয়েকটির গতিপথ পশ্চিমবাহিনী করার কথা ভাবা হচ্ছে। এখান থেকে শুরু হয় আরেক প্রসঙ্গের- প্রাকৃতিক জলবন্টন প্রণালীকে দম্ভ ভরে পরিবর্তন করার চেষ্টা।

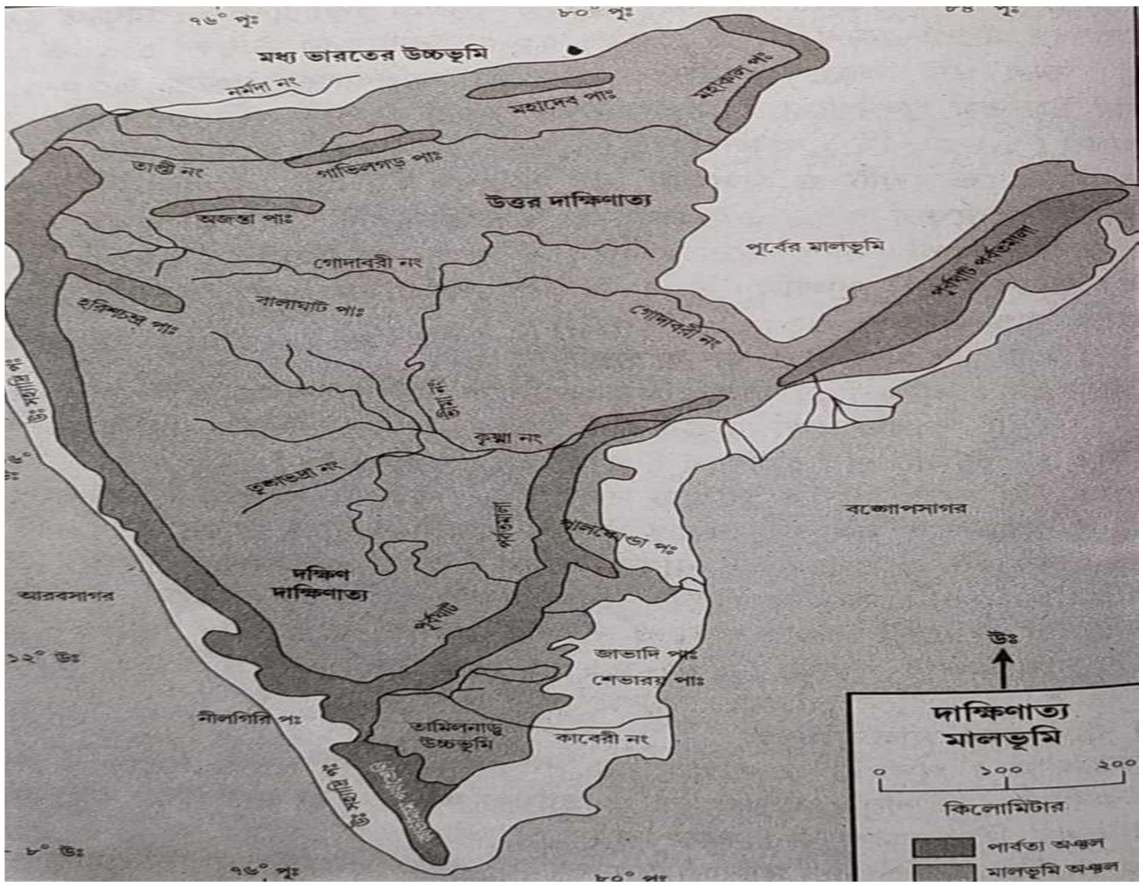

আগে জলব্যবস্থা যে গ্রামগত ভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টার অন্তর্গত ছিল, তাকে কেন্দ্র করে কিছু চর্যা ছিল, সেসব প্রশাসনিক আওতাধীন হওয়ায় বর্তমানে জলব্যবস্থা কয়েকটি সরকারি প্রকল্পের আওতাধীন হয়েছে মাত্র। পূর্বেই জেনেছি গ্রামে কুন্ড বা পুকুর তৈরি করা হলে প্রস্তুতকর্তা তার দায়িত্ব দিতেন গোটা গ্রামকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব থাকত ঐ পুকুর বা কুন্ডের সামনে বাসকারী পরিবারের। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে জল নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতার বদলে দেখতে হল জল'কে কিভাবে সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়ার সম্পত্তিতে পরিণত করেছি। কাবেরী নদীর খরাপ্রবণ অববাহিকার ৩৬.৯০ শতাংশ এলাকা তামিলনাড়ুতে এবং ৬৩.১০ শতাংশ কর্ণাটক রাজ্যে

অবস্থিত।[১২] সুতরাং পানীয় জল ও কৃষিতে জলসেচের পর্যাপ্ত জোগানোর জন্য দুটি রাজ্যের মধ্যে জল বন্টন নিয়ে বিবাদ ঘটলো। যে এলাকায় নদী অববাহিকার বেশিটা বর্তমান, সেই এলাকা দাবি করল নদীর অতিরিক্ত কিউসেক জল। কৃষ্ণা নদী মহারাষ্ট্র কর্ণাটক তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় কৃষিকাজের জন্য জল সেচ ও পানীয় জলের উৎস জন্য এই চারটি রাজ্যকে অনেকাংশে কৃষ্ণার উপর নির্ভর করতে হয়। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণা জল বন্টন সংক্রান্ত প্রথম ট্রাইবুনালের চুক্তিতে ৫৬০ বিলিয়ন কিউসেক, কর্নাটকের জন্য ৭০০ মিলিয়ন কিউসেক ও পূর্বতন অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য ৪০০ বিলিয়ন কিউসেক জল নির্ধারিত হয়।[১৩] কিন্তু ২০১৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে তেলেঙ্গানা রাজ্য তৈরি হলে কৃষ্ণার জল বন্টন নিয়ে নতুন করে বিবাদ তৈরি হয়। একইভাবে গোদাবরীর জল নিয়ে চারটি রাজ্যের মধ্যে বিবাদ শুরু হলে পচামপাড়ু বাঁধ তৈরি করে এই বাঁধের ঊর্ধ্ব অববাহিকা ও নিম্ন অববাহিকার জল কে দুটি অংশে ভাগ করে বিলির ব্যবস্থা করা হয়। ইরাবতী, বিপাশার জল নিয়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা আর নর্মদার জল নিয়ে গুজরাট, মধ্যপ্রদে, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান বিবদমান। সিন্ধু তার উপনদীগুলো নিয়ে যে নিম্নগতিতে পাকিস্তান হয়ে আরব সাগরে পড়েছে, তাতে তার জলবন্টন নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব হচ্ছে। ভারত পরিমাণে কম জল পাচ্ছে ভাগে আর এই নদী অববাহিকাটি থর মরুভূমি সংলগ্ন হওয়ায় সেচের একমাত্র উৎস। শুধুমাত্র দলাদলির কারণে সিন্ধুর গতিপথ কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন করার কথা ভাবা হচ্ছিল! আবার ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ জলবন্টন সংক্রান্ত কমিশন আছে। গঙ্গা নদীর সামান্য অংশ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করলেও তার মূল শাখা নদী পদ্মা বাংলাদেশের অন্তর্গত এবং বাংলাদেশের কৃষি কাজের অধিকাংশ পদ্মার উপর নির্ভরশীল। নিয়ম অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের ফলে প্রয়োজনীয় জলসেচের খুব সামান্য অংশই বাংলাদেশ সরকার পায়। আবার তিস্তা নদীর নিম্নগতি বাংলাদেশ,

এখানে এই নদী ব্রহ্মপুত্র তথা যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ফলে সম পরিমাণ জলের দাবি নিয়ে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে দড়ি টানাটানি খেলা চলছে, যে জিতবে জল তার। যে জল আমাদের প্রাকৃতিক ধন-সম্বল, তা কি করে যেন একদিন এরকমভাবে ভাগযোগ্য সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে টুকরো হয়ে গেল! এই যে গঙ্গা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্রের লীলাভূমি, এখানেই গত কয়েক বছরে মজে গেছে একের পর এক অসংখ্য নদী। অবৈজ্ঞানিক কার্যকলাপে, অত্যাধুনিকতার দম্ভে পালটে দিতে চেয়েছি নদীর প্রাকৃতিক গতিপথকে। ইতিমধ্যে প্রায় সবাই জানেন, জলপাইগুড়ি জেলায় ডুয়ার্সের অন্যতম বড় নদী মাল-এর গতিধারার মাঝখানে মাটি পাথর ইত্যাদি দিয়ে আড়াআড়ি বাধা নির্মাণ করে পাশে খুঁড়ে দেওয়া নতুন ধারাতে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা হয়েছিল।[১৪] তা সেই বিসর্জনের বেশ কিছু আগে থেকেই বৃষ্টিপাত হচ্ছিল, হঠাৎ নদী বেয়ে ঝড়ের গতিতে বিপুল জল নেমে আসলে কয়েক মিনিটের মধ্যে কোনও প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই প্রচণ্ড ধারার মুখে সব ভাসান আয়োজন ভেসে যায়। নদীর যাতায়াতের পুরোনো জায়গা নদী কখনও ভোলে না, সে ইচ্ছেমত সেই খাত দিয়ে একদিন বয়ে যেতে পারে, নদীরও হাত পা ছড়ানোর ইচ্ছে হতে পারে তার তীর বরাবর। সেসব ভাবনাকে তুড়ি দিয়ে বা 'কব্জা করতে পারব' ভেবে উড়িয়ে দেওয়া গেছে। 'হড়পা বান' ডুয়ার্সের নদীগুলির স্বভাব। মধ্য বা নিম্ন হিমালয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাতের জল এরা তীব্রধারায় নীচে অপেক্ষাকৃত সমতলে পৌঁছে দেয়। ঢাল কমে আসার দরুন সমতলে জলস্রোতের তীব্রতা হ্রাস পায়, তা অনেকটা জায়গা ধরে ছড়িয়ে স্বাভাবিক বন্যার কারণ হয়। সমতলে নেমে আসা এই জল গচ্ছিত থেকে হিমালয়জাত নদীদের প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখে। কিন্তু প্রকৃতির সূক্ষ্ম শৃঙ্খলাকে বোঝার চেষ্টামাত্র না করে প্রযুক্তিদম্ভ দেখিয়ে ফেলেছি প্রবল ভাবে। এর মর্মান্তিক ফলশ্রুতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। আর যাই হোক মানুষের

নৃতত্ত্বগত বিচারে যে হাত তার প্রধান প্রযুক্তিবল, তা দিয়ে জলকে কোনোদিন ধরা যায়নি আর যাবেওনা, তাকে ক্রমাগত বইতে দিতে হয়।

১৯৭১ সালে বিশ্বব্যাপী জৈবপরিবেশ রক্ষার সম্মিলিত প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে ইরানের রামসারে জলাভূমি নিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়। কোনো অঞ্চল প্রাকৃতিক বা প্রায় প্রাকৃতিক বিরল অথবা অন্যান্য উদাহরণ যুক্ত জলাভূমি কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলে সে জলাভূমি আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। উলার লেক, ভেম্বনাদ কয়াল জলাভূমি, রেনুকা হ্রদ, চিল্কা হ্রদ সহ ভারতের রামসার সাইট ঊনপঞ্চাশ টি। পশ্চিমবঙ্গের দশটি রামসার সাইটের মধ্যে সুন্দরবন ও পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের তুলনায় জলাভূমিসংক্রান্ত সমস্যাই মূল। সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী সুন্দরবন উপকূল অঞ্চলের মাটি ক্রমান্বয়ে বসে যাচ্ছে, কিন্তু বেড়ে চলেছে সমুদ্রের জলের উচ্চতা। সঙ্গে সুন্দরবন এলাকার নদীগুলিতে ধারাবাহিক পলি জমার কারণে জলধারণ ক্ষমতা কমছে। বাঁধ নির্মাণে প্রচুর টাকা যাচ্ছে অথচ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে জর্জরিত হয়ে পড়ছে উপকূলের নদী, সমুদ্র-বাঁধের গুণগত মান। আবার পূর্ব ভারতের জলাভূমি কলকাতা শহরের কিডনির মত কাজ করে জানি। ভৌগলিক ভাবে কলকাতা ভারতের অন্যতম নিচু শহর, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাপলে চার-পাঁচ মিটারও হবে না। কলকাতার পশ্চিমে গঙ্গা, অথচ শহরের ঢাল পূবে। প্রতিদিন শহরে প্রায় সাতশো মিলিয়ন লিটার তরল বর্জ্য উৎপন্ন হলেও সেগুলো সব, এমনকি বৃষ্টি হলেও জল না জমে পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে পড়ত। আটের দশকের একজন সরকারি অফিসার ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ চারিদিকে অনুসন্ধান চালিয়ে কলকাতার বর্জ্য জলের নিকাশি কোথায় খুঁজে বের করেন। ৯৫ শতাংশ জল এবং ৫ শতাংশ জীবাণু নিয়ে বর্জ্যজল পূব কলকাতার বিশাল জলাভূমিতে পড়ে শৈবাল ও মাছের খাদ্যে পরিণত হয়। ফলে স্রেফ প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রেই সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির সাহায্যে ও

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় পুরো জল পরিশুদ্ধ অবস্থায় চলে আসে, বিপুল মাছের ভাণ্ডার তৈরি করে—পুরোটাই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে—বিন্দুমাত্রও শোধন করাতে হয় না! ১৯৯০ সাল নাগাদ জ্যোতিবাবুর সরকার ঘোষণা করেন—ওই জলাভূমি বুজিয়ে একটা বিশাল বড় বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ধ্রুবজ্যোতি বাবু ও PUBLIC নামের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দ্বারা হাইকোর্টে মামলা করে বন্ধ করা হয় এই রায়। প্রায় তিরিশ হাজার মানুষের জীবিকা সরাসরিভাবে জড়িত এই জলাভূমির সঙ্গে। আজও আমরা জানিই না, রোজ গরম গরম ভাতের সঙ্গে পাতে যে মাছের ঝোল বা ঝাল খাই, তার বেশিরভাগটাই আসে আসলে এই জলে গড়ে ওঠা ভেড়ি থেকে। পাশাপাশি, বিপুল পরিমাণ শাকসবজির জোগান দেয় এই এলাকা। স্রেফ এই কারণেই ভারতের সমস্ত মহানগরের মধ্যে বাজার খরচের ব্যাপারে সবচেয়ে সস্তা আমাদের কলকাতা। বিপুল পরিমাণ অক্সিজেনের জোগানও দেয় এই জলাভূমি। কার্যত একটি পয়সাও খরচ না করে দূষিত জল নিয়ে সে ফেরত দেয় টাটকা জল, মাছ, শাকসবজি, অক্সিজেন। এবং যে বিপুল পরিমাণ জলে প্রতিদিন ভেসে যেতে পারত কলকাতা, তার বেশিরভাগটাই টেনে নেয় এই জলাভূমি, তারপর অবশিষ্ট চলে যায় বিদ্যাধরী নদীতে। তাই অন্তত বছর দশেক আগে অবধি মুম্বই বা চেন্নাই নিয়মিত বন্যায় ভেসে গেলেও দিব্যি টিকে যেত কলকাতা। আজ ভেঙে পড়েছে পুরো ব্যবস্থাটাই। চলছে যথেচ্ছ প্রোমোটিং, জলাভূমি ভরাট, নগরায়ণ। চলছে দূষণ। ফলে নজিরবিহীন সংকটের মুখে পূর্ব কলকাতার এই জলাভূমি। প্রকৃতি সামান্য রুষ্ট হলেই আজ ভেসে যাচ্ছে কলকাতা। জমা জলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, জলবাহিত ও মশাবাহিত রোগ বাড়ছে। নদীয়ার বুক থেকে জলঙ্গী প্রায় উধাও। জলঙ্গী মূর্শিদাবাদে গঙ্গার শাখানদী হিসেবে রয়েছে, আবার ভাগীরথীতে মিশে তার নিম্নভাগকে শক্তিশালী করেছে রীতিমতো। এই জলঙ্গী আর চূর্ণীর (রাণাঘাটে) মধ্যে সংযোগ ঘটায় অঞ্জনা। বিসর্জন ঘাট হিসেবে ব্যবহৃত হতে হতে, পাশে ইটভাটা গজিয়ে উঠে এবং শহরের অরক্ষিত নিকাশী নালা

নদীর জলের সাথে সংযুক্ত থাকার ফলে দুই নদীই মজে গেছে। নদীয়ার এই দিকটায় মৎস্য চাষীরা সংখ্যায় বেশি, অথচ মাছের ঐতিহ্য শেষ। অঞ্জনায় পলি পড়ে চর তৈরি হয়ে গেছে। যে অঞ্জনা কৃষ্ণনগরের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সৌন্দর্য বিধান করত, সেই অঞ্জনা আর নেই। আমরা শহর গড়তে গিয়ে ভুলে গেছি জলাভূমিও শহরের সৌন্দর্য্য বিধান করতে পারে, তাকে নিয়েও শহরের সংস্কৃতি হতে পারে। আসলে প্রকৃতি'র মধ্যেই আমরা, 'আমি'র দাম্ভিকতায় সেখানে সম্পর্ক বানাতে গেলে হবেনা, দরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা |

References

Fundamental Duties

<https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fundamental_Rights,_Directive_Principles_and_Fundamental_Duties_of_India>, date: 19/10/2022.

Dasgupta Mohan Birendra, 'English-English dictionary', calcutta-9, Sahitya Samsad, 1968, page. 751

Same as, page. 571.

জয়া মিত্র, 'জলের নাম ভালোবাসা', কলিকাতা পুস্তকমেলা, খোয়াই, ২০০১, পৃ.২৮।

অনুপম মিশ্র। অনুঃ নিরুপমা অধিকারী। 'কুন্ড'। জয়পুর, প্রকাশক আশাবরী, ২০০৪, পৃ.২৫।

Mishra Anupam, *'Ponds are still relevant'*, Haryana, Paryavaran Mitr. Foundation, 1993, page.22

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'বাংলার ব্রত'। কলকাতা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ.১০।

Mishra Anupam, *'Ponds are still relevant'*, Haryana, Paryavaran Mitr. Foundation, 1993, page.48.

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'বাংলার ব্রত'। কলকাতা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ.৭।

কল্যাণ রুদ্র। 'দুই বাংলার নদীকথা'। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, প্রথম সং. ২০২১, পৃ.২১।

ঐ, পৃ.২৫

ড. যুধিষ্ঠির হাজরা গোপাল চন্দ্র বণিক। 'আধুনিক পরিবেশবিদ্যা'। কলকাতা, ২০২২, পৃ.৮৭।

ঐ, পৃ.৮৯।